Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 241 – 246
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

কিশোর উপন্যাসে সত্য, ধর্ম ও পৌরুষের প্রতিষ্ঠা : সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'ইতি তোমার মা'

শুভঙ্কর রায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদহ
ইমেইল : suvha1988roy@gmail.com
ও
অধ্যাপক ড. সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ ও ডিন, মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞান ও বাণিজ্য অনুষদ
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদহ
ইমেইল : saurenugb@gmail.com

Keyword
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সত্যের প্রতিষ্ঠা, ধর্মের প্রতিষ্ঠা, পৌরুষের জয়, প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা, জীবনবোধ।

Abstract
'শিশুসাহিত্যে' সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের অবদান অনস্বীকার্য। 'শিশুসাহিত্য' রচনায় তিনি শুধুমাত্র নিজস্ব রচনাভঙ্গিরই আমূল পরিবর্তন ঘটাননি, একই সঙ্গে ছোটদের পরিবর্তনের কথাও ভেবেছেন। অনেক শিশুসাহিত্যিক ফ্যান্টাসিজাতীয় রচনা, রূপকথা, লোককথা কিংবা কল্পনায় ডানামেলা ইত্যাদি বিষয়কে কিশোর সাহিত্যের বিষয়বস্তু করে তুলেছেন। যেমন— টুনটুনি পাখি এই জগতের প্রতাপশালী রাজাকে জব্দ করতে পারে, শিয়াল পন্ডিতের আসনে বসতে পারে, এমনকি হেড অফিসের বড়বাবুর গোঁফও চুরি যেতে পারে। এই সমস্ত অবিশ্বাস্য কল্পনা শিশু নির্দ্বিধায় সত্যি বলে গ্রহণ করে। ভালো লাগলে সে আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে আবার যখন দুঃখ পায় তখন চোখে জল আসে। আবার কখনো দেখা যায়, ভয়ে সে মায়ের আঁচলে লুকিয়ে পড়ে। সে মনে করে এই পৃথিবীতে সব কিছুই সম্ভব। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'ইতি তোমার মা' একটি ভিন্ন স্বাদের কিশোর উপন্যাস। এখানে রূপকথা, লোককথা কিংবা কল্পনার কোন স্থান নেই। উপন্যাসটির মধ্যে হাসি-ঠাট্টার উপাদানও আমরা খুঁজে পাই না। ছেলেবেলা থেকেই যাতে ছোটদের জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসা যায়, তিনি সেই কথাই ভেবেছেন। শিশুরা যাতে অল্প বয়স থেকেই বড় হবার, মানুষ হবার প্রেরণা পায়, সেই দিকটার দিকেই তিনি বেশি নজর দিয়েছেন। আগুনে না পোড়ালে যেমন খাঁটি সোনা পাওয়া যায় না, ঠিক তেমনি দুঃখ-কষ্ট ভরা বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতা ছাড়াও খাঁটি মানুষে পরিণত হতে পারে না। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এই সত্যটিকেই 'ইতি তোমার মা' কিশোর উপন্যাসে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। একটি বালক কিশোর জীবনে কিভাবে বিভিন্ন ঘাত–

প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে প্রতিকূল অবস্থাকে জয় করতে শিখলো, সত্য ও ধর্ম কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হল, প্রতিকূল পরিস্থিতিকে জয় করে ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করতে শিখলো—তারই এক গভীর ও মর্মস্পর্শী কাহিনী 'ইতি তোমার মা'।

Discussion

বিশেষ শ্রেণির একটি সাহিত্য সম্ভারকে আমরা 'কিশোরসাহিত্য' রূপে আখ্যা দিয়ে থাকি। কিশোর পাঠকের কথা ভেবেই কিশোর সাহিত্যের সূচনা ঘটেছে। সাহিত্যের আগে 'শিশু' কিংবা 'কিশোর' শব্দ বসিয়ে কিশোর মনের উপযোগী সাহিত্যকে চিহ্নিত করা হয়। সেই কারণে 'কিশোর সাহিত্য' নির্দিষ্ট বয়সের পাঠকের কথা মনে করেই লেখা হয়। সেই কারণে বলা যেতে পারে, ছোটদের জন্য রচিত সমস্ত সাহিত্যই শিশু সাহিত্যের অন্তর্গত। ফ্রয়েড, গুস্তাভ, ইয়ুঙ, এডলার প্রমূখ মনোবিদ যৌবনের পরবর্তী জীবনের তিনটি ভাগ লক্ষ করেছেন। শৈশবকাল, বাল্যকাল এবং কৈশোর কাল। পাঁচ থেকে ছয় বছর পর্যন্ত শৈশবকাল, ছয় থেকে বারো বছর পর্যন্ত বাল্যকাল এবং বারো থেকে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত সময়কাল কৈশোররূপে বিবেচিত। উনিশ শতকে ছোটদের জন্য যখন লেখা শুরু হয়, তখন বাংলার লেখকগণের মূল লক্ষ্য ছিল তাদের সামনে নীতিমূলক আখ্যান উপস্থিত করে মানসিক চরিত্র গঠন করা। মদনমোহন তর্কালঙ্কার 'শিশুশিক্ষা' (১৯৫০) গ্রন্থের তৃতীয় ভাগের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন—

> "কেবল মনোরঞ্জনের নিমিত্ত শিশুগণের উন্মেষোন্মুখ নির্ম্মল চিত্তে কোন প্রকার কুসংস্কার সঞ্চারিত করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। এ নিমিত্ত হংসীর স্বর্ণডিম্ব প্রসব, শৃগাল ও সারসের পরস্পর পরিহাস নিমন্ত্রণ, ব্যাঘ্রের গৃহদ্বারে বৃহৎপাকস্থলী... প্রভৃতি অসম্ভব অবান্তর বিষয় সকল প্রস্তাবিত না সুসম্বন্ধ নীতিগর্ভ আখ্যান সকল সম্বন্ধ করা গেল।"[১]

'কিশোরসাহিত্য' নীতিশিক্ষার জগত থেকে অনেক দূরে রয়েছে। নীতিশিক্ষার জগত ছাড়িয়ে তারা বহির্বিশ্বের দিকে রওনা দিয়েছে। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'ইতি তোমার মা' ভিন্নধর্মী উপন্যাস। উপন্যাসের প্রথমেই দেখি দাদু নাতিকে একটি এলার্ম ঘড়ি উপহার দিয়ে কয়েকটি কথা বলেন—

> "রোজ ভোরবেলা সূর্য ওঠার আগে বিছানা ছাড়বি। রোজ ঝড় হোক জল হোক ব্যায়াম করবি, পরিষ্কার ঠান্ডা জলে চান করবি। আর কাজ ফেলে আড্ডা মারবি না।"[২]

কোন কাজ করার আগে সংকল্প নেওয়া দরকার। সেটাই হল মানুষের ধর্ম। কাজ ছাড়া কখনোই বসে থাকা উচিত নয়, কারণ অলস মস্তিষ্ক হল শয়তানের বাসা। তাই মস্তিষ্ককে কখনোই অলস করা ঠিক নয়। যতদিন মানুষ ছাত্রাবস্থায় থাকে সেই সময়টা খুবই সুখের হয়। বাঁচার একটা কারণ থাকে। আমি শিখছি, আমি কত কি জানতে পারছি, পৃথিবী আমার হাতের মুঠোয় এসে যাচ্ছে। দিন আরম্ভ হচ্ছে আর শেষ হচ্ছে তা কিন্তু নয়।

প্রতিদিন আমরা কিছু না কিছু শেখার জন্য বেঁচে আছি। অতি অল্প বয়স থেকেই মানুষের কথামৃত, বিবেকানন্দের লেখা পড়া উচিত। কারণ গাছ যখন ছোট থাকে তখনই তার গোড়ায় সার দিতে হয়। গাছ বড় হয়ে গেলে শিকড় মাটির গভীরে চলে যায়। তখন আর ভাবনা নেই। গাছ তখন নিজে নিজেই তার জিনিস সংগ্রহ করে নিতে পারবে। ঠাকুর বলতেন—

> "মাটির হাড়ি যখন নরম, তলতলে থাকে, কাঁচা থাকে, তখনই তাকে আকার দেওয়া যায়, নকশাটকশা সব করা যায়। পোড়াবার পর যখন সিঁদুরে লাল, ঝনঝনে, খনখনে হয়ে গেল তখন আর তাতে কিছু করা যায় না। করতে গেলেই ভেঙে যায়।"[৩]

এমন একটা জীবন তৈরি করা উচিত যাতে লোকের একশো বছর দুশো বছর তিনশো বছর পাঁচশো বছর মনে রাখে। সব মায়েরা যেন তাদের ছেলেদের বলতে পারে ওনার মত হও। শ্রীচৈতন্য আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে

সেই দূর কোন নবদ্বীপে জন্মেছিলেন। আজও তাঁকে সারা পৃথিবীর মানুষ পূজা করেন। শ্রীচৈতন্য কিংবা বিবেকানন্দের মত মানুষ হতে গেলে অনেক সাধনার প্রয়োজন। সেই সাধনা সম্পর্কে লেখক সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন—

> "চুপ! ওই দেখ গাছের ডালে মাছরাঙ্গা কেমন স্থির হয়ে বসে আছে। একেই বলে সাধনা।
>
> কিসের সাধনা বাবা?
>
> মাছের সাধনা দেখ না কি হয়।
>
> মাছরাঙ্গা সত্যিই রাঙা পাখি। হঠাৎ সাঁ করে জল ছুয়ে উড়ে গেল। ঠোঁটে একটা রুপোলি মাছ লটপট করছে। কি সুন্দর কায়দা।"[৪]

ছেলেবেলা থেকেই নিজেকে ধরতে আর ছাড়তে শিখতে হবে। কাজে, কথায় চরিত্রে সৎ হতে হবে। সর্বোপরি মনটাকে স্থির রাখতে হবে। লেখক উল্লেখ করেছেন—

> "ঘুড়ি, লাটাই আর সুতো। মন হল ঘুড়ি, সুতো হল ইচ্ছে আর বিচার হল লাটাই। মন ঘুড়ি উড়তে চাইছে, বাড়তে চাইছে। ইচ্ছের সুতো ভলভল করে ছাড়ছি। কোন্ আকাশে, কোন্ বাতাসে ভেসে গিয়ে, কোন বিপাকে পড়বে কেউ জানে না। অমনি বিচারের লাটাই ঘুরিয়ে তাকে টেনে আনো।"[৫]

কখনোই হিংসা করা উচিত নয়। সব সময় সামনের দিকে তাকাতে হবে। পেছনের জিনিস পেছনেই পড়ে থাক। মনের মাপে দেহ তৈরি করতে হবে, দেহের মাপে মন তৈরি নয়। শক্তির চেয়ে বুদ্ধির জোর অনেক বেশি। সেই কারণে পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করতে পারে। দেহের মধ্যেই মানুষের মন থাকে। লেখক সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন—

> "পাঁচ ফুট ছ' ইঞ্চি, পাঁচ ফুট আট, পাঁচ দশ, বড়জোর ছ' ফুট, এইতো দেহের মাপ। মনটা ওই কুলপি বরফের খোপের মাপে জমে যেন না যায়। মন হবে দৈত্যের মতো, পাহাড়ের মত গর্জন, গাছের মতো বিশাল। আর সেই মনকে ধরার চেষ্টা করবে দেহ। মন বলবে চাঁদ ছোঁও, দেহ ছুঁয়ে আসবে। মন বলবে এভারেস্ট ধরো, দেহ ধরে ফেলবে। দেহ তখন ছ'ফুট নয়, ছ' মাইল ছ লক্ষ মাইল।"[৬]

উপন্যাসে আমরা বড়লোকের বখাটে ছেলে শ্যামলের সন্ধান পাই। শ্যামলের বাবা অসৎ কারণ সে দু'নম্বরী ব্যবসার কারবার করে। সেই কারণে শ্যামলকেও ভালো সংস্কার দিতে পারেননি। তবে উপন্যাসের শেষে আমরা শ্যামলকে ভালো হতে দেখেছি। ছেলেবেলা থেকেই তাকে কেউ ভালো হওয়ার কথা বলেননি। আর এই জন্যই ধীরে ধীরে সে অসৎ সঙ্গ পেয়ে বিগড়ে গেছে। একদিন শ্যামল বুড়োকে আচমকা ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। বুড়ো তার বাবার কাছে জানতে চায় এখন তার কি করা উচিত? বুড়োর বাবা উত্তরে জানায়—

> "না না, যার-যার সমস্যার সমাধান তার-তার কাছে। এরকম অনেক ধাক্কা আসবে। সামলাতে হবে। স্ট্যান্ড করতে হবে। দেহে আসবে। মনে আসবে।"[৭]

মানুষের দুঃখ, কষ্ট, জ্বালা, যন্ত্রণা সবই তো মন দিয়ে বুঝতে হয়। পিঁপড়েরা খাবারের সন্ধান কিভাবে পায়? তার একটি সুন্দর উপমা দিয়ে লেখক বুঝিয়েছেন। প্রথমে একটা পিঁপড়ে এদিক ঐদিক বেড়াতে বেড়াতে চিনি কিংবা গুড় পড়ে থাকার সন্ধান পায়। সে একটু চেখে দেখার পর, ধরফড় করে ফিরতে শুরু করে দেয়। দেখাযায় এক সার পিঁপড়ে আসছে আর একটা মাত্র পিঁপড়ে উল্টো দিক থেকে আসছে। সে প্রত্যেকের সামনে থেমে থেমে শুঁড়ে শুঁড়ে কি বলে যাচ্ছে। সে প্রত্যেককে ওই খবরটা দিচ্ছে ভাইসব চলো। মানুষের মনও ওই পিঁপড়ের মতো। সারা শরীরে ঘুরে বেড়ায়। শরীরের কোথাও কোন সামান্য গোলমাল দেখলেই অনবরত খবর পাঠাতে শুরু করে মাথার মূল ঘাঁটিতে। আর তখনই আমরা ছটফট করতে থাকি। এই মন পিঁপড়েকে যদি ব্যথার জায়গায় না যেতে দিয়ে অন্য কোনখানে পাঠিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে আর কোন ব্যথা থাকবে না, বেদনা থাকবে না, আরাম থাকবে না, সুখ থাকবে না, আনন্দ থাকবে

না। মনটাকে একবার হাতের মুঠোয় নিতে পারলেই জীবন সার্থক। লেখক বারবার মৃত্যু প্রসঙ্গকে এখানে টেনে এনেছেন। যেমন—

> "ধর, তোর দাদি! এই তো, এই তো সেদিন ছিলেন, আজ আর নেই। জানিস তো, মানুষের সঙ্গে মানুষের জীবনে একবারই দেখা হয়। তোর দাদি একবারই আমার বাবা হয়েছিলেন। আর কখনও, কখনও আর হবেন না। আমি হু হু করে যতই কাঁদি না কেন। একবার, সবকিছুই একবারের জন্যে।"[৮]

আসলে লেখক শিশুমনকে শক্ত করার জন্য এইসব প্রসঙ্গের কথা বারবার তুলে ধরেছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন— মাটির হাড়ি যখন কাঁচা থাকে সেই কাঁচা অবস্থায় যা আকার আকৃতি দিতে হয়। পাকা খনখনে হয়ে যাবার পর আর কিছুই করার থাকেনা কারণ কিছু করতে গেলে তখন ঠুন্ করে ভেঙ্গে যায়। আসলে লেখক এই কাঁচা মনে এখন থেকেই বৈরাগ্যের রং ধরাতে চেয়েছেন। তাহলে এবার স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে বৈরাগ্য কি? আসলে বৈরাগ্য হল সবকিছুর মধ্যে থেকেও না থাকা। কোন কিছুকে আঁকড়ে না ধরা, সংসার নিয়ে পাগল না হয়ে যাওয়া। কোন কিছুর জন্যই দুঃখ-সুখ থাকবে না, কোন কাজ হলে হলো, না হলে না হলো। নিয়মিত শরীরচর্চা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। সেই দিকটাকেও লেখক সুন্দরভাবে আলোকপাত করেছেন। একসময় বুড়ো শ্যামলের উপর বদলা নেওয়ার জন্য শরীর চর্চা করতে শুরু করে। মারের বদলে মার, হিংসার বদলা হিংসা, এটা তো পথ নয়, পথ হল ক্ষমা। লেখক উল্লেখ করেছেন—

> "আমার দাদি আমাকে বলতেন, দ্যাখ্ বুড়ো, অহিংসা, ক্ষমা এসব অনেক উঁচু জিনিস, সকলের জন্যে নয়। পশুরা বুঝবে না। যারা ব্রুট, তাদের দাবাতে হবে শক্তি দিয়ে। তাদের ক্ষমা করতে যাওয়ার মানে হবে দুর্বলতা।"[৯]

সাহিত্যিক শিশুদের মানসিক গঠনে ছেলেবেলা থেকেই 'দীক্ষা', 'জপমন্ত্র', 'বীজমন্ত্র'— এই সমস্ত কিছুরই প্রবেশ করানোর চেষ্টা করেছেন। 'দীক্ষা' হল— গুরুর কাছে মন্ত্র নেওয়া, 'জপ' হল— একই মন্ত্র বার বার উচ্চারণ করা, সেটা একশো আট বার হতে পারে বা হাজার আশি বারও হতে পারে। আর 'বীজমন্ত্র' হল—একটিমাত্র অক্ষর, যার ধ্বনি আছে, ঝংকার আছে। সব মন্ত্র যার মধ্যে জমে থাকে। দীক্ষা না নিলে মানুষের ভেতরটা কখনোই জেগে ওঠে না, তাই দীক্ষা নিতে হয়। 'সংস্কার' হচ্ছে মনের একটা ভালো অবস্থা, যা মানুষ নিয়ে আসে। যেমন কেউ ঠাকুরের কাছে এসে বলে, আমাকে শক্তি দাও। কেউ আবার ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে বলে, আমাকে একটা টনিক লিখে দিন তো, যাতে আমার শক্তি হয়। কেউ বাবা-মাকে খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। আবার কেউ গ্রাহ্যই করে না। কেউবা গান শুনলে মোহিত হয়ে যায়, আবার কেউ ভীষণ বিরক্ত হয়। সবকিছুই যেন পূর্বজন্মের ব্যাপার। তবে সাহেবেরা এই পূর্বজন্ম মানেন না, কিন্তু আমরা মানি। আমরা কি এই প্রথম জন্মেছি? না, আমরা এর আগে হাজারবার, লক্ষবার জন্মেছি। সেই কারণেই কেউ পাঁচ বছর বয়সেই সাংঘাতিক ভালো তবলা বাজায়, সেতার বাজায়। কেউবা ভালো ছবি আঁকেন, কেউবা শক্ত শক্ত অংক কষেন। কেউ আইনস্টাইন তো কেউ আবার নিউটন। তার উত্তর একটাই পূর্বজন্মে সে এইসব করত, আর সেই জ্ঞানটাই সে এই জন্মে নিয়ে এসেছে। বুড়োর দাদীও গভীর রাতে শক্ত শক্ত অংক কষতেন। বুড়ো জিজ্ঞেস করতেন, কার জন্য এই অংক কষা? উত্তরে দাদি বলতেন, নিজের জন্য অর্থাৎ পরের জন্মের ভিত তৈরি করছি। মানুষের জীবনে শুরু এবং শেষ বলে কিছু নেই। একটা মানুষ যখন আসে তখন তার শুরু, আর সেই মানুষটা যখন চলে যায় তখন তার শেষ। মানুষ হল একটা ঘট। মহাকাল সময়ের সমুদ্রে সেই ঘট ডুবিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন। মানুষ একটু একটু করে জল ঢালতে ঢালতে এক সময় সব শেষ করে ফেলেন। আর তখনই সেই শূন্য ঘট ঈশ্বর ভেঙ্গে দেন। আমরা ইচ্ছা করলেও সেই জল ধরে রাখতে পারি না। কারণ ভগবান আমাদের পাঠানোর সময় ছটা ফুটো করে দিয়েছেন। এই ছটা ফুটো হল ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। আর সেই ফুটো ধরে ফিনকি দিয়ে সময় বেরিয়ে যাচ্ছে। আমরা মনে করলেও সেই সময়কে ধরে রাখতে পারব না, কারণ সে স্বাধীনতা আমাদের নেই। 'তৈলঙ্গ স্বামী' প্রায় তিনশো বছর বেঁচেছিলেন। ভগবান মানুষের শরীরে ফুসফুস নামক একজোড়া যন্ত্র বসিয়ে দিয়েছেন। এই ফুসফুসের সাহায্যে

মানুষ শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকে। মানুষ যখন জ্ঞানী ছিল, তখন তারা শ্বাস-প্রশ্বাস দিয়ে আয়ু মাপত, বছর দিয়ে নয়। সেই কারণেই যোগীরা প্রাণায়াম শিখেছিলেন। প্রাণায়াম হল শ্বাস-প্রশ্বাসকে খুশি মত কমানোর কায়দা। মানুষ যতো কম নিঃশ্বাস নেবে, সে তত বেশি দিন বাঁচবে। যোগীরা একবার শ্বাস নিয়ে অনেকক্ষণ থাকতে পারেন। সেই কারণেই তারা বেশি দিন বাঁচেন। এই পদ্ধতিকেই বলা হয় 'কুম্ভক'। 'সঙ্কল্প' কি? সঙ্কল্প হল— সর্বদা সত্য কথা বলা, সত্যকে জানা এবং সত্যকে ভালোবাসা অর্থাৎ সৎচিন্তা, সৎকর্ম, সৎসঙ্গ অর্থাৎ সৎ, চিৎ, আনন্দ। দেহ এক পবিত্র মন্দির আর সেই মন্দিরে পবিত্র মনই হচ্ছেন ভগবান। এখানে বুদ্ধি হল বেদি, চিন্তা হল ফুল, পূজা হল কর্ম। শুরু হল সঙ্কল্প মন্ত্র— 'নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত।'

উপন্যাসের শেষে আমরা দেখতে পাই বুড়োর মায়ের ব্লাড ক্যান্সার। ব্লাড ক্যান্সার একটি মারণ রোগ। মায়ের অসুখের কথা বুড়োর বাবা জানতে পেরে একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু বুড়ো একবারের জন্য হলেও ভেঙ্গে পড়েনি। বুড়োর মন এখন আগের চেয়ে অনেক বড় শক্ত। এরপর হঠাৎ একদিন বুড়োর মা চির ঘুমের দেশে পাড়ি দিলেন। অসুস্থ শরীরে তাঁর মা একটি চিঠি বালিশের তলায় রেখেছিল। সেই চিঠিটিই তাঁর পথ, সেই চিঠিটিই তার গুরু।

> "স্নেহের বুড়ো,
>
> আর কয়েকদিন পরেই আমি চলে যাব। দূরে, বহু দূরে। আমার অনেক সাধ ছিল, কত কি করার ছিল। খেলা না ফুরাতে খেলাঘর ভেঙ্গে গেল। জীবনে একবারই দেখা হয়। তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। তুমি বড় হও। যত পারো, বেড়ে ওঠো। আমি নেই বলে তোমার বড় হওয়া যেন আটকায় না। আমার জন্য মন খারাপ কোরো না। আমি নেই বলে আরো বেশি করে থাকবো। তুমি আমাকে দেখতে পাবেনা। কিন্তু আমি তোমাকে দেখব। তোমার বাবা যেন এই রকম শিশুই থাকেন। বোলো তাঁকে। যেখানে আমি যাচ্ছি, সেখানে তোমরা থাকবে না, এইটাই আমার দুঃখ। যাওয়াটা এইরকম আগে পরেই হয়ে যায়। যে খেলার যা নিয়ম!
>
> সব সময় সোজা পথে চলবে। সমস্ত ব্যাপার বুদ্ধি দিয়ে নয় হৃদয় দিয়ে বোঝার চেষ্টা করবে। রোজ আয়না সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়াবে। নিজের মুখ দেখবে স্থির নজরে। যখনই দেখবে চোখের উজ্জ্বলতা কমছে, তখনই চিন্তার দিকে নজর দেবে। চিন্তায় মানুষ। একা থাকবে না। কাজকে সঙ্গী করবে। বাবার মত গাছপালা, জীবজন্তু, পশুপক্ষীকেই বন্ধু করবে। সবুজের ঘরে থাকলে মানুষ চির সবুজ থাকে। দিতে শিখবে, নিতে নয়। 'আমি আমি' করবে না। 'আমি' বলে কিছু নেই। সবই 'তুমি'। ভেতরটাকে বড় করলে বাইরেটা বড় হয়। নকল থেকে আসল বেছে নিতে শেখো। তোমার দাদীর বাড়িকে অপবিত্র কোরো না। প্রতিষ্ঠা মানে সত্যের প্রতিষ্ঠা। ঐশ্বর্য হল চরিত্র। যুদ্ধ হল নিজের সঙ্গে। জয় হল নিজেকে জয়।
>
> সব সময় মনে রাখবে তুমি কোন্ পরিবারের ছেলে। পিতা মাতা পিতামহকে ভুলো না।
>
> বিদায়। অনেক অনেক ভালোবাসা। জল নয় আগুন।—ইতি তোমার মা।"[১০]

শিশু-কিশোরের জীবন পরিবর্তনের এক অসামান্য দলিল 'ইতি তোমার মা'। শিশুদের জীবনগঠন, শৃঙ্খলা পরায়ন হওয়া, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা, মানুষের সাধারণ ধর্ম কি হওয়া উচিত, সর্বোপরি পৌরুষের প্রতিষ্ঠা ও জীবনবোধ— লেখক সবকিছুরই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন। উপন্যাসের শেষে আমরা দেখি, বখাটে ছেলে শ্যামল, সে বাবার বিরুদ্ধে কোর্টে সাক্ষী দিয়েছে। শ্যামল নিজের ভুল বুঝতে পারে। শ্যামল ভালো হতে চাইলেও তাকে কেউ ভালো হতে বলেনি। সেই কারণেই সে নিজের বাড়িতে না গিয়ে পরবর্তীতে আশ্রমেই থেকে যায়। শ্যামলের বাবাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যায়। নিরপরাধ বুড়ো নির্দোষী খালাস পায়। আসলে লেখক ছেলেবেলা থেকেই শিশুদের মনে সৎ চিন্তা, সৎ বুদ্ধি, সত্য ও ধর্মের বাণী, আচার-আচরণ, সংস্কার, অহিংসা, ক্ষমা—ইত্যাদি বিষয়গুলিকে তাদের মধ্যে

প্রবেশ করিয়ে আদর্শনিষ্ঠাবান পুরুষে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এখানেই অন্যান্য কিশোর উপন্যাসিকদের তুলনায় সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় স্বতন্ত্র।

তথ্যসূত্র :

১. আশিস, খাস্তগীর সম্পাদনা, 'শিশুশিক্ষা', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশঃ নভেম্বর ১৯৮২, পৃ. ১৯
২. সঞ্জীব, চট্টোপাধ্যায়, 'ইতি তোমার মা', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৯৫, পৃ. ৭
৩. তদেব,পৃ. ৩০–৩১
৪. তদেব
৫. তদেব,পৃ. ৩৪
৬. তদেব,পৃ. ৩৫
৭. তদেব,পৃ. ৩৮
৮. তদেব,পৃ. ৪৫
৯. তদেব,পৃ. ৫০
১০. তদেব,পৃ. ১১৮–১১৯